কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম
ব্রিফিং নোট
৩২

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিক-ভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দূর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

জাতীয় উন্নয়নে যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার সাথে প্রায়শই স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন চাহিদার অসমাঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এটি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। অথচ এ উন্নয়নের সুফল সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যেতে না পারলে এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে না, এবং এসডিজির মূল দর্শন 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' এ প্রত্যয়ও বাস্তবায়িত হবে না। যাদের জীবনমানের উন্নতির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে, স্থানীয় পর্যায়ে তারা সেগুলিকে কীভাবে মূল্যায়ন করছেন তা সঠিকভাবে জানা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু, প্রান্তিক জনগণের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করা ও তাদের অভিমত মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ সীমিতই থেকে যাচ্ছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও স্থানীয় বাস্তবতার এই প্রথাগত টানাপোড়ন বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে যাচাই করা প্রয়োজন। উন্নয়নের সুফল সবাই সমানভাবে পাচ্ছে কি না, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কি না প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম স্থানীয় সমাজের এসব ব্যক্তিকে নিয়ে ২০২২ সালের ১৩ আগস্ট সিলেটে একটি নাগরিক পরামর্শ সভার আয়োজন করে। ওই সভায় সিলেট বিভাগের চারটি জেলার স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজের ৬৫ প্রতিনিধি অংশ নেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন।

নাগরিক পরামর্শ সভা: সিলেট

সিলেট বিভাগের চ্যালেঞ্জ দুর্গমতা, স্যানিটেশন ও সুপেয় পানির প্রাপ্যতা

সূচনা বক্তব্য

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি)'র সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সভার প্রারম্ভে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে দেশে বৈষম্য বেড়েছে কি না, খাদ্য ও পুষ্টির অবস্থা কেমন, পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন হয়েছে—প্রভৃতি বিষয় জানা প্রয়োজন। কেননা দেশের উন্নতি সবাইকে ছুঁয়েছে কি না, সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্কুলে শিশুদের উপস্থিতি আগের চেয়ে বেড়েছে, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে মেয়েরা তুলনামূলকভাবে বেশি ঝরে পড়ছে। উপবৃত্তি চালু থাকা সত্ত্বেও একটি পরিবারের পক্ষে শিক্ষার্থীর আনুষঙ্গিক পুরো খরচ মেটানো সম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেন, বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতি হয়েছে। তবে সবাই এ অগ্রগতির ভাগীদার হচ্ছে কি না এবং সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতসহ অন্য পরিষেবাগুলো সমাজের সাধারণ মানুষ, প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষ ও তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছাচ্ছে কি না, তা বোঝার জন্য নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এ আলোচনা সভাগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় করে আসছে।' নতুন একটি পর্যায়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সরকারের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হচ্ছে, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না,

কোনো ঘাটতি থাকছে কি না প্রভৃতি বিষয় নির্ণয় করা জরুরি, বিশেষ করে ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত দৃষ্টিকোণ থেকে। এরই ধারাবাহিকতায় সিলেটে এই নাগরিক পরামর্শ সভাটি আয়োজন করা হয়েছে।

সভায় জানানো হয়, পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার অনুপাত সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম। অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে জানান, এই পরিসংখ্যান অঞ্চলের অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে তুলে ধরলেও বর্তমানে দারিদ্র্যের হার জাতীয় পরিসংখ্যানের সঙ্গে কতটা সংগতিপূর্ণ, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এ বিভাগে সিলেট সদর সবচেয়ে অগ্রসর জেলা হলেও এখানে উন্নয়নের সুফল সবাইকে সমানভাবে উপকৃত করেনি। যেমন- সিলেট নগরীর বস্তি এলাকার কিশোরী মেয়েরা আর্থিক অনটনের কারণে সর্বোচ্চ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে থাকে। যদিও স্কুলে ভর্তির হার অতীতের তুলনায় বেড়েছে, তবু শিক্ষা সমাপ্ত করা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন বছরে একবার নগরীর আশপাশের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলেও বস্তি এলাকার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেয় না। এতে করে সেখানকার বাসিন্দাদের ভোগান্তি ও আশপাশের এলাকার দূষণ আরও তীব্র হচ্ছে। সুপেয় পানির অপর্যাপ্ততা, স্যানিটেশন ও উচ্চ বেকারত্ব সিলেট অঞ্চলের প্রধান সমস্যা বলে অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন।

স্বাস্থ্যসেবার প্রধান প্রতিবন্ধকতা দুর্গমতা

আলোচনায় হাওড় অঞ্চলের বহুমুখী সমস্যার কথা জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীরা জানান, অঞ্চলভিত্তিক পুরোনো সমস্যাগুলো এখনো বিদ্যমান। এসব সমস্যার মধ্যে অন্যতম অনুন্নত আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিশেষ করে জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপজেলার সঙ্গে জেলা শহর ও বিভাগীয় শহরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুনামগঞ্জের শাল্লা ও সিলেটের মধ্যে সরাসরি কোনো রাস্তা নেই। সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হলেও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেই। ফলে শাল্লা থেকে কোনো ব্যক্তিকে সিলেট শহরে আসতে সময় লাগে প্রায় ছয় ঘণ্টা। আর রাজধানীতে যাতায়াতের জন্য এর দ্বিগুণ সময় ব্যয় হয়। শাল্লার স্থানীয় গ্রামীণ রাস্তাঘাটে কেবল মোটরবাইক চলাচল করতে পারে। এর ফলে রোগীদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অসুবিধা হয় এবং অনেকে পথেই প্রাণ হারায়। স্থানীয় সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের অপ্রতুলতার কারণে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলায় উন্নয়নের সুফল পৌঁছাচ্ছে না।

অংশগ্রহণকারীরা মত প্রকাশ করেন, দুর্গমতার পাশাপাশি এ বিভাগের হাওর অঞ্চলের আরেকটি বড় সমস্যা হলো স্যানিটেশনের অপর্যাপ্ততা। অনেক গ্রামে এখনো মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে। সরকারিভাবে স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণ করা হলেও কেবল সরকারি দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাই তা থেকে উপকৃত হয়। ফলে সমস্যাগুলো সমাজে থেকেই যাচ্ছে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্যানিটেশন সুবিধাগুলো প্রভাবশালীরা তাদের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করে। ফলে যেসব মানুষ এসব সুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত, তারা উপকারভোগী হতে পারছে না। আলোচনায় উঠে আসে, সিলেট বিভাগের অন্যান্য জেলার তুলনায় সুনামগঞ্জ পিছিয়ে রয়েছে। এই পিছিয়ে থাকার মূল কারণ স্বাস্থ্যসেবা, পয়ঃনিষ্কাশন এবং শিক্ষা ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের অপ্রতুলতা। এছাড়া সুনামগঞ্জে বাল্যবিয়ের হারও অনেক বেশি।

সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলে শিক্ষাগত অসুবিধার বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। দিরাই উপজেলার ১৬৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি বড় অংশে নিয়মিত পাঠদান হয় না। কারণ এ স্কুলগুলোর অধিকাংশই জলবেষ্টিত এলাকায় অবস্থিত এবং নৌকা ছাড়া সেগুলোয় যাতায়াতের কোনো উপায় নেই। প্রধানত জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যাতায়াতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়ার কারণে শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হতে পারেন না।

আলোচনায় হাওর অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণের প্রস্তাব উঠে আসে। হাওরের জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন রেখে পরিকল্পিতভাবে সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার বিষয়ে মত দেন অংশগ্রহণকারীরা। এটা করা হলে এ

অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও উপযুক্ত পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যাবে। অনেকে হাওর অঞ্চলের জন্য ইকোলজিক্যাল জোন ডিজাইনের পরামর্শ দেন।

স্থানীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিতরণে রাজনৈতিক ছত্রছায়া

অংশগ্রহণকারীরা জানান, স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ বিতরণে ক্রমাগতভাবে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে উন্মুক্ত জলাশয়ে সাধারণ মানুষদের মাছ ধরার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ছে। এর পেছনে মূল কারণ দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও জবাবদিহিতার অভাব। অংশগ্রহণকারীরা জানান, হাওর অঞ্চলের কৃষকরা বছরের একটি বড় সময় জীবিকা নির্বাহ করেন মাছ ধরে। কিন্তু মৎস্য চাষ প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। প্রভাবশালীরা অপরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক জলাশয় এলাকায় ভূমি ভরাট করার কারণে মৎস্যবিচরণ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং কৃষকদের আয়ের উৎস ঝুঁকিতে পড়েছে। সরকার বিভিন্ন জলাশয় ইজারা দেওয়ার ফলে এ সমস্যা আরও গুরুতর হয়ে উঠছে এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ে সাধারণ মানুষের মাঝ ধরার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ছে।

অবকাঠামো উন্নয়নে ঘাটতি

অবকাঠামোগত উন্নয়নে সিলেট বিভাগ পিছিয়ে আছে বলে অভিমত দেন অংশগ্রহণকারীদের অনেকে। যদিও সরকারের দাবি, সিলেট অঞ্চলে বেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে। স্থানীয় নাগরিক সমাজের মতে, যেসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে, সেগুলো যথাযথ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। এক্ষেত্রে মানহীন উন্নয়ন কার্যক্রমের নিদর্শন হিসেবে গ্যাস লাইনে লিকেজের বিষয়টি উল্লেখ করেন অংশগ্রহণকারীরা। প্রতিটি লাইনে লিকেজ থাকায় বিপুল পরিমাণ গ্যাস সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে। সংবাদপত্রে বিষয়টি উঠে আসার পর কেবল একটি লাইন মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া বিমানবন্দর থেকে বাইপাস সড়ক নির্মাণের জন্য এ পর্যন্ত মোট ছয় বার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হলেও প্রকল্পের নির্মাণকাজ এখনো শুরু হয়নি।

পাথর উত্তোলন ও জলবায়ু পরিবর্তন বাড়াচ্ছে বন্যার ঝুঁকি

অংশগ্রহণকারীরা মত প্রকাশ করেন, সিলেটের সাম্প্রতিক বন্যা পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফল। পাশাপাশি দেশব্যাপী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য গত ১৫-১৬ বছরে সিলেট জেলা থেকে পাথর উত্তোলন করা হয়েছে। পাথর সংগ্রহের ফলে জাফলংয়ের কাছে নদীর প্রবাহ পরিবর্তন হয়েছে। গত ১২২ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় সিলেটে সাম্প্রতিক বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং বন্যায় ভেসে যায় বেশ কিছু গ্রাম ও কয়েকশ মানুষের জীবিকার উৎস। দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত উদ্বেগ এখন একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে বলে বক্তারা মনে করেন।

বর্জ্য বিভাজন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার তাগিদ

এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা জানান, গাড়ির মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ করে ডাম্পিং স্টেশনে স্থানান্তর করার ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আগের তুলনায় কিছুটা উন্নত হয়েছে। তবে এ ধরনের সরকারি সেবার বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। ফলে সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা ব্যবহারের চাহিদার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে সাধারণ মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ঘাটতি বিদ্যমান। নাগরিকদের সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে অবহিত করা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা বাড়াতে নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ নিতে হবে জানিয়ে অংশগ্রহণকারীরা মত প্রকাশ করেন।

চা শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা ও তাদের অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বর

অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল চা বাগানের শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার পরিস্থিতি। তখন চলমান আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে বক্তারা উল্লেখ করেন, চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১২০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করার দাবিতে বিক্ষোভ চলছে। তারা উল্লেখ করেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতি শ্রমিকদের জন্য তাদের পরিবারের মৌলিক পুষ্টিচাহিদা মেটানো কঠিন করে তুলেছে। পাশাপাশি তাদের চিকিৎসা ও শিশুদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

চা বাগানগুলো শ্রমিকদের জন্য যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা দেয়, সে বিষয়ে জানতে চাইলে অংশগ্রহণকারীরা জোর দিয়ে বলেন, এ সুবিধাগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। স্কুলগুলোয় ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কম হওয়ার পাশাপাশি চা বাগানে কোনো সরকারি স্কুল কার্যকর পাঠদান করে না। চা শ্রমিকদের সন্তানরা মূলত এনজিও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। একইভাবে চা বাগানে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ কেবল ডায়রিয়া নিরাময় ও প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের ব্যবস্থাপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চা বাগানে প্রয়োগ করা রাসায়নিক দ্রব্য ও কীটনাশকের কারণে শ্রমিকদের ত্বকে সংক্রমণ দেখা দেয়। এ সংক্রমণ চিকিৎসায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো কেবল সাধারণ মলম বিতরণ করে থাকে। এর বাইরে চা শ্রমিকদের বাড়িতে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য কোনো ওষুধ দেওয়া হয় না।

আলোচনায় উঠে আসে, চা বাগানগুলোয় মিঠাপানি ও স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা শ্রমিকদের জন্য একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা। বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হয়ে থাকেন। অংশগ্রহণকারীরা জানান, দৈনন্দিন কাজের জন্য অনেকে আবাসস্থলের কাছাকাছি বিভিন্ন চ্যানেলের পানি ব্যবহার করেন, যে পানি স্বাস্থ্যকর নয়। এছাড়া চা বাগানগুলোয় প্রয়োজনীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। ফলে শ্রমিকরা বাধ্য হন খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার জন্য তাদের পানি ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। অনেকেই বালি বা মাটি ব্যবহার করেন। এর ফলে নারী শ্রমিকরা নিয়মিত মূত্রনালি বা প্রজনন অঙ্গের সংক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

অংশগ্রহণকারীরা দাবি করেন, চা শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর কখনো নীতিনির্ধারকদের কাছে পৌঁছে না। আবার যে শ্রমিকরা তাদের অধিকারের পক্ষে কথা বলেছে, তারা মালিক এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রভাবশালীদের দ্বারা আর্থিক ও সামাজিক ঝুঁকির শিকার হয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে চা শ্রমিক নেতারা ব্যক্তিস্বার্থ বা অন্যান্য কারণে গোষ্ঠীগত স্বার্থের পরিপন্থি কাজ করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, শ্রমিকরা ভালো অবস্থায় আছেন। জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক মর্যাদাগত কারণে সিলেটের চা শ্রমিকরা সামাজিকভাবে নিগৃহীত হওয়ায় সাধারণ নাগরিকরা শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলান না বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল যে, চা শ্রমিকরা যেখানে বসবাস করে, তাদের সেই জমির মালিকানা দেওয়া উচিত এবং সাম্প্রতিক উচ্চমূল্যের চা রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত টি এস্টেটের আর্থিক মুনাফা থেকে নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে হস্তান্তর করা উচিত।

নাগরিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছাত্রসমাজ

চা শ্রমিক আন্দোলনের মতো কমিউনিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিমত জানতে চাইলে তারা উল্লেখ করেন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আন্দোলন করা হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। তাছাড়া যারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের নানা ধরনের প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এসব কারণে বিভিন্ন নাগরিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের

ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করেন, তাদের ক্যাম্পাসে ভয়ের সংস্কৃতি রয়েছে। এ সংস্কৃতি নাগরিক সমাজের নানা পদক্ষেপকে প্রভাবিত করছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মতামত প্রকাশে ভয় পাওয়া থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন অংশগ্রহণকারীরা। নাগরিক আন্দোলনে যুবসমাজের অংশগ্রহণ কমে যাওয়ার মূল কারণ হিসেবে এই ভয়ের সংস্কৃতিকে দায়ী করেন অংশগ্রহণকারীরা।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সাম্প্রতিক একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তারা জানান, একজন অধ্যাপক নিজেই ক্যাম্পাসের বর্জ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শিক্ষার্থীরা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন এবং তারা তাদের ক্যাম্পাস পরিষ্কার রাখার বিষয়ে এ ঘটনা থেকে উদ্বুদ্ধ হন। এটিকে নাগরিক উদ্যোগের একটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল সিলেটের সভায়। শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, তারা যে মূল্যবোধগুলোকে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করেন, সেগুলো শনাক্তকরণ ও বজায় রাখার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করেন, আবহমানকাল ধরে সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন, যেসব শিক্ষক ও জনপ্রতিনিধিরা নানা ধরনের নেতিবাচক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত, দিন শেষে তারা নানাভাবে পুরস্কৃত হন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বড় অন্তরায় বলে তারা উল্লেখ করেন।

শিক্ষার্থীরা সিলেট অঞ্চলে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় উন্নয়নের বিষয়টি স্বীকার করলেও অনেক স্থানেই যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি বলে মন্তব্য করেন। এছাড়া হবিগঞ্জে গণশৌচাগার ও বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা এখনো একটি বড় সমস্যা বলে তারা উল্লেখ করেন।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন উপেক্ষিত

সিলেট অঞ্চলের এ সংলাপে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে সার্বিকভাবে এই অভিমত উঠে আসে যে, সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা ও অধিকারের বিষয়ে সজাগ নয়। 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার এবং সুরক্ষা আইন, ২০১৩' সম্বন্ধে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানে না। বক্তারা উল্লেখ করেন, সিলেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা এত বেশি যে, প্রতিটি বাড়িতে হয়তো একজন প্রতিবন্ধী সদস্য পাওয়া যেতে পারে। উচ্চ-আয়ের পরিবারগুলোর মধ্যে প্রতিবন্ধী সদস্যদের সমাজ থেকে আড়াল করার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ তারা বিশ্বাস করে, প্রতিবন্ধিতা একটি অভিশাপ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা এখনো বিরাজমান। কারণ সামাজিক অবহেলা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি নেতিবাচক মানসিকতার পরিবর্তন না হওয়ায় এখনো তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়নি। তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাও অপর্যাপ্ত। আর্থিক অনটনের কারণে অনেকেই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়ছে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে শিশুর দিবাযত্ন কেন্দ্র, সরকারি এতিমখানায় লোকবল বাড়ানো ও নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উঠে আসে আলোচনায়। সরকারি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র দু-একটি থাকলেও সিলেটে বেসরকারি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র একেবারেই নেই বললে চলে। তাছাড়া এক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হলেও সেগুলো নারীবান্ধব নয়।

অন্যদিকে এতিমখানাগুলো কম কর্মী দ্বারা পরিচালনা করা হয়। কিছু কেন্দ্রে মাত্র একজন কর্মীর মাধ্যমে প্রায় ৪০ জন শিশুর দেখাশোনা করা হয়। ফলে নানা সময় দুর্ঘটনা ঘটে।

আলোচনায় উঠে আসে, কোভিড মহামারী চলা কালে অনেক নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সিলেটে তাদের পণ্য বিপণন ও বিক্রির জন্য কোনো মার্কেট গড়ে ওঠেনি।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবক্ষয়

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি সিলেটের আলোচনায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবক্ষয়ের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। এ ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। তিনি বলেন, দেশের অগ্রগতি সাধন শুধু সরকারের একার বিষয় নয়, এক্ষেত্রে নাগরিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। সিলেটের দারিদ্র্য ও শিশুশ্রম নিরসন এবং চা শ্রমিকদের চাহিদার বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার পাশাপাশি তাদের কণ্ঠস্বর সোচ্চার করার বিষয়ে আলোচনায় জোরালো মতামত উঠে আসে।

আলোচনা পর্ব শেষে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন যে, সিলেট নাগরিক পরামর্শ সভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে এ ধরনের সংলাপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম তৃণমূলের কণ্ঠস্বর জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি সংলাপের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: ফাবিহা বুশরা খান

সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সহযোগী সম্পাদক: অভ্র ভট্টাচার্য

আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সহযোগিতায়

UNDP
UN environment
United Nations Environment Programme

সহযোগী প্রতিষ্ঠান

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE
HEKS EPER Bread for all
Manusher Jonno Foundation
TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH Social movement against corruption
WaterAid

www.bdplatform4sdgs.net | BDPlatform4SDGs | Citizen'sPlatformforSDGsBangladesh | BDPlatform4SDGs

নভেম্বর ২০২২

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা

ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net